যক্ষা সচেতনতা ৩
শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ ৪
ডেঙ্গু জ্বর ৫
বাংলাদেশ এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠী ৮

স্বাস্থ্য সংলাপ

CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ

বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১-২ শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ ১৪১১

স্থূলত্ব: সমস্যা, সতর্কতা ও চিকিৎসা

সাবিনা আহমেদ

দৈহিক প্রয়োজনীয়তার চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত মেদ জমা হওয়ার কারণে দেহের অস্বাভাবিক ওজন ও আকার বৃদ্ধিকে স্থূলত্ব বা obesity বলা হয়। বাহ্যিক (যেমন অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণ) বা অভ্যন্তরীন (যেমন বংশগতি, হরমোনের অস্বাভাবিকতা) নানা কারণেই একজন ব্যক্তি স্থূল দেহের অধিকারী হতে পারেন। বর্তমান বিশ্বে শিশু ও বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোর-কিশোরীদের মাঝেও স্থূলত্ব ব্যাপক হারে দেখা দিতে শুরু করেছে।

দেহ-ভর সূচক বা Body mass index (BMI)-এর তালিকার সাহায্যে খুব সহজেই স্থূলত্বের ঝুঁকিপূর্ণ শিশু (BMI >৯৫%) চিহ্নিত করা সম্ভব। কেজিতে-মাপা শরীরের ওজনকে মিটারে-মাপা উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করে BMI নির্ণয় করা হয়। ওজন নির্ধারণের মাধ্যমে একজন চিকিৎসক স্থূলত্বের কারণ সম্বন্ধে ধারণা পেতে পারেন। দেহের অভ্যন্তরীন জটিলতার (হরমোন-সংক্রান্ত) কারণে স্থূল শিশু সাধারণত খাটো এবং তাদের হাড়ের বয়স বিলম্বিত (Delayed bone-age) হতে দেখা যায়। অপরদিকে বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত স্থূল শিশু সাধারণত লম্বা এবং তাদের হাড়ের বয়স অগ্রগামী (Advanced bone-age) হয়। মেদবহুলতার কারণে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নির্ধারণে দেহ-ভর সূচক এখনও পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত (সারণী)।

একাধিক জটিলতার সূত্রপাত

স্থূলত্ব--যাকে অন্য কথায় মেদবহুলতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়--এখনও পর্যন্ত সাধারণত প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণের ফল বলে বিবেচিত হয়। নিঃসন্দেহে অতিমাত্রায় ক্যালোরিযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, সুষম খাদ্য সম্বন্ধে স্বল্পজ্ঞান বা সুষম খাদ্যগ্রহণে ব্যর্থতাই স্থূলত্ব বা মেদবহুলতার প্রধান কারণ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় স্থূলত্বকে এমন একটি সমস্যা বলে বিবেচনা করা হয়, যা থেকে নিত্যনতুন অসুস্থতার সূত্রপাত ঘটাও সম্ভব। স্থূলত্বের জটিলতা হিসেবে নিম্নোক্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং এগুলো স্থূল ব্যক্তির সাধারণ স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে:

১. কোমর বা গোড়ালি ব্যথা
২. প্রচণ্ড মাথা-ব্যথা
৩. দিবাভাগে ঝিমুনি বা ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসকষ্ট
৪. পিত্তথলির অসুস্থতা
৫. হরমোন-সংক্রান্ত জটিলতা
৬. উচ্চ রক্তচাপ, করোনারী হার্ট ডিজিজ (হৃদরোগ), ইশকেমিক শক, টাইপ-২ ডায়াবেটিস
৭. ক্যান্সার (স্তন, কোলোন, প্রোস্টেট, কিডনী, এন্ডোমেট্রিয়াল)

ছবি: ইন্টারনেট

সারণী: দেহ-ভর সূচকের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যের শ্রেণীবিন্যাস

শ্রেণীবিন্যাস	দেহ-ভর সূচক	স্বাস্থ্যের ঝুঁকি
স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজন	< ১৮.৫	বেশি
স্বাভাবিক ওজন	১৮.৫-২৪.৯	কম
স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ওজন	২৫-২৯.৯	বেশি
স্থূল শ্রেণী ১	৩০-৩৪.৯	উচ্চ
স্থূল শ্রেণী ২	৩৫-৩৯.৯	অতি উচ্চ
স্থূল শ্রেণী ৩	> ৪০.০	অতিমাত্রায় উচ্চ

(গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)

Source: WHO. Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a World Health Organization consultation on obesity, Geneva, WHO, 2000; p.9

CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টিবিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক কর্মকাঠামোও আইসিডিডিআর,বি'র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নত মানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	ডেভিড এ. স্যাক
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম. শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	এম.এ. রহীম
সদস্য	আসেম আনসারী
	রুকসানা গাজী
	মোঃ জালালুদ্দীন হোসেন
	মোঃ ইকবাল
	মোঃ সিরাজুল ইসলাম
	মনজুর আহমদ খান
	মৃদুলা মিত্র
	মোঃ আনিসুর রহমান
	রুকসানা হাকিম
	পিটার থর্প

কভার ডিজাইন	আসেম আনসারী
ডেস্কটপ প্রকাশনা ও প্রকাশনায়	এম.এ. রহীম

প্রকাশক
আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেল্থ এন্ড পপুলেশন রিসার্চ
মহাখালী, ঢাকা ১২১২ (জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০)
বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮৬ ০৫২৩-৩২, ৮৮১ ১৭৫১-৬০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮৬ ৮২২৪ ও ৮৮২ ৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

মুদ্রণ: দোর প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালী, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

৮. প্রজনন-সংক্রান্ত উর্বরতাশক্তি হ্রাস

৯. মানসিক ও সামাজিক সমস্যা

স্থূলত্বের ইতিহাস মানব-ইতিহাসের মতই প্রাচীন। যুগ যুগ ধরে স্থূলত্বের চিকিৎসায় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যায়ামকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে কয়েক দশক ধরে স্থূলত্বের চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি এবং ওষুধ ব্যবহার শুরু হয়েছে।

নিজের শরীর সম্বন্ধে উদাসীনতা, দৈহিক কর্মতৎপরতার অভাব, অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ, পুষ্টি সম্বন্ধে অপ্রতুল জ্ঞান, সীমিত ব্যায়াম, অতিমাত্রায় টেলিভিশন দেখা, ফাস্ট ফুডে আকৃষ্ট হওয়া, ইত্যাদি কারণগুলোকে প্রায়শ স্থূলত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ কম্পিউটার এবং ভিডিও গেমকেও টেলিভিশনের সমগোত্রীয় বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে এগুলোও টেলিভিশনের মত প্রভাব ফেলবে, বিশেষ করে শিশুদের কর্মতৎপরতার ওপর।

স্বাভাবিক মানবদেহের জন্য প্রতিদিন ১,৮০০ থেকে ২,৫০০ কিলোক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন। সঞ্চিত শক্তির ব্যবহার অনেকটাই নির্ভর করে পারিবারিক পরিবেশ, ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা এবং জীবন-যাপন প্রণালীর ওপর। অতিরিক্ত ক্যালোরি দেহকোষের ভেতরে চর্বি আকারে জমা হয়। ওজন বেশি-হওয়া এবং স্থূলত্ব দু'টি ভিন্ন ব্যাপার। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার ব্যক্তির ওজন যখন তার উপযোগী (optimum) ওজন অপেক্ষা ১০ শতাংশ বেশি হয় তখন তার ওজন বেশি বলে ধরা হয়, কিন্তু তিনি স্থূল নন। যখন বর্তমান ওজন তার উপযোগী ওজন অপেক্ষা ২০ শতাংশ বেশি হয় তখন তাকে স্থূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ডায়াবেটিস (বহুমূত্র) বা হাইপার টেনশন (উচ্চ রক্তচাপ)-এর মতো স্থূলত্বও একটি স্বাস্থ্য সমস্যা, যার দীর্ঘকালীন চিকিৎসা আবশ্যক। একজন ব্যক্তির ওজন ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে তার রক্তচাপ ৭ মি.মি. (পারদ) এবং রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা ১১ মি.গ্রা/১০০ মিলি বৃদ্ধি পায়। কিছু কিছু ব্যক্তির মেদ জমা-হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তবে এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে, তিনি অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণে এবং অলস সময় কাটাতে বেশি আগ্রহী।

অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত। আবার পেশাগত কারণেও একজন ব্যক্তি (যেমন বাবুর্চি) অতিমাত্রায় খাদ্যগ্রহণ করতে পারেন। বিভিন্ন ওষুধ দ্বারা প্রভাবিত নৈরাশ্য বা বিষন্নতাও অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের কারণ হতে পারে।

ডায়েট পিল: বেশিরভাগ স্থূল ব্যক্তিই কমবেশি হীনমন্যতায় ভোগেন। আবার একশ্রেণীর ব্যক্তি মোটা হওয়ার ভীতি বা ফোবিয়ায় আক্রান্ত। বিশেষ করে উচ্চবিত্ত সমাজে তরুণ এবং যুবতী মহিলারা চিকন বা স্লিম থাকার উদ্দেশ্যে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই বিশেষ পথ্য গ্রহণ করেন। ওজন হ্রাসের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা ডায়েট পিলের আশ্রয় নেন। প্রয়োগকৃত এসব পিল সাধারণত anorecties বা anorexigenics নামে পরিচিত। এসমস্ত ওষুধ ব্যবহারকারী ব্যক্তি উভয়সংকটে ভোগেন, কারণ যদিও এগুলোর সহায়তায় খুব দ্রুতই ওজন হ্রাস পায়, অধিককাল ব্যবহারে অদূর ভবিষ্যতে দেখা দেয় নানান উপসর্গ ও মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। তবে আশার কথা এই যে, U.S. Food and Drug Administration কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত এসব ওষুধের প্রধান উপাদানটিকে স্বীকৃতি দেয় নি।

ওজন বৃদ্ধির সমস্যা কিছু বংশগতি-সংশ্লিষ্ট (Genetical) এবং কিছু পরিবেশগত (Environmental) নির্ণায়কের সমন্বয়ে সৃষ্ট। আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন দ্বিতীয় কারণটিই চিকিৎসা ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

নিয়মিত ব্যায়াম ও হাঁটার অভ্যাস করলে স্থূলত্বের জটিলতা কমে আসে (ছবি: ইন্টারনেট)

সতর্কতা ও চিকিৎসা: মাত্রাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ মেদবহুলতার কারণ বলে চিহ্নিত হলে জরুরী ভিত্তিতে রক্তচাপ নির্ণয়সহ কিছু দরকারি ল্যাবরেটরি পরীক্ষা, যেমন রক্তের শর্করা, ইনসুলিন, কোলোস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, উচ্চ ও নিম্ন ঘনত্বসম্পন্ন লিপিড, যকৃতের কার্যকারিতার পরীক্ষা, ইত্যাদি করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে একজন পুষ্টিবিদের সহায়তায় বয়সানুযায়ী ক্যালোরি-নিয়ন্ত্রিত খাদ্যগ্রহণে স্থূলতায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণই সফল চিকিৎসার নির্দেশক। তার সাথে শিশুকে উপযোগী ব্যায়াম করায় উৎসাহিত করতে হবে। শুধুমাত্র টেলিভিশন দেখার সময় কমিয়ে দিয়েই শিশুর দৈহিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিবার- ভিত্তিক আলোচনা ও সদস্যদের সহায়তা শিশুদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম। শিশুর ওজনের স্থায়ী পরিবর্তনই স্থূলত্বের চিকিৎসায় প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিশুর পরিবারকে স্থূলত্বের জটিলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে হবে। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে চিকিৎসা সফল করার উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করতে হবে। শিশুর খাওয়ার অভ্যাস এবং তার কর্মতৎপরতা ও সক্রিয়তার ওপর নজর রাখতে হবে।

প্রতিদিনের খাদ্যের ক্যালোরির হিসাব না রেখে, তার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া বা বাদ দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুধার্ত বা বঞ্চিত অনুভব করবে না। একটি বা দু'টি উচ্চ ক্যালোরিসম্পন্ন খাবার, যেমন বিস্কুট, আইসক্রীম বা ভাজাপোড়া খাবার খাওয়া থেকে স্থূল ব্যক্তিকে বিরত রাখা যেতে পারে। প্রতিদিন ১০০ কিলোক্যালোরি'র ঘাটতি বছর শেষে ৫ কেজি ওজন কমাতে সক্ষম। অলস সময় কমিয়ে আনার মাধ্যমে ও সক্রিয়তা বাড়িয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রতিদিন এক থেকে দুই ঘণ্টা টেলিভিশন দেখা কমিয়ে তা অর্জন করা সম্ভব। তবে মনে রাখা উচিত যে, ওজন নিয়ন্ত্রণ বা কমানোর ক্ষেত্রে কিছু জটিলতার সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র নয়, যেমন খুব দ্রুত ওজন হ্রাস পিত্তথলির অসুখ বা অপুষ্টির কারণ হতে পারে।

স্থূল রোগীর মধ্যে আবেগজনিত জটিলতা দেখা দিতে পারে, যা থেকে খাদ্য-সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলতা বা Eating disorder এবং হীনমন্যতার সৃষ্টি হতে পারে। শিশুদের স্বাস্থ্যবান এবং চিকন রাখবার আরেকটি উপায় হচ্ছে বুকের দুধ খেয়ে বেড়ে-ওঠা শিশুরা অপেক্ষাকৃত সহজে নিজের ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থূলতার সমস্যা উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইদানিং অপেকক্ষাকৃত বেশি প্রতীয়মান হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশের মত মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তাই প্রতিরোধ কৌশল হিসেবে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন।

যক্ষা সচেতনতা: সময়ের দাবি

সায়রা বানু

ক্ষয়কাশ নামে দীর্ঘকাল ধরে যে-রোগটি গ্রামবাংলায় পরিচিত সেটিই যক্ষা। "যার হয় যক্ষা তার নাই রক্ষা" প্রবাদটির ভয়াবহতা আগের মতো না থাকলেও ভয়াবহ সত্য হচ্ছে সংক্রামক রোগে মৃত্যুহারের বিবেচনায় আমাদের দেশে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ার পরেই যক্ষার স্থান। পৃথিবীর যক্ষাপীড়িত দেশসমূহের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যক্ষা-সংক্রামিত বলে ধারণা করা হয়। প্রতিবছর পৃথিবীজুড়ে আশি লক্ষ লোক যক্ষাপীড়িত হয় এবং এদের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ রোগী মারা যায়। বাংলাদেশে প্রতিবছর আনুমানিক তিন লক্ষ লোক যক্ষায় আক্রান্ত হয় এবং প্রায় সত্তর হাজার রোগী মারা যায়।

যক্ষা জীবাণুঘটিত একটি সংক্রামক রোগ। জীবাণুটির নাম মায়কোব্যাক্টেরিয়াম টিউবার-কুলোসিস। যক্ষারোগীর হাঁচি-কাশির ক্ষুদ্রকণা বাতাসে ভেসে এ-রোগ ছড়ায়। শতকরা আশিভাগ যক্ষারোগীর প্রধানত ফুসফুসই আক্রান্ত হয়। এছাড়াও অস্থি, গ্রন্থি, মূত্র ও প্রজননতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, অন্ত্র, এমনকি শরীরের অন্য যেকোনো অংশও সংক্রমণের শিকার হতে পারে। ফুসফুস-আক্রান্ত যক্ষারোগী, যাদের কফের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় যক্ষার জীবাণু পাওয়া গেছে, তারাই সবচাইতে বেশি ছোঁয়াচে বলে বিবেচিত। যাদের তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি (কাশির সাথে কফ বা রক্ত বের হোক বা না হোক), জ্বর, বুকে ব্যথা, স্বল্পশ্বাস, ওজন কমে-যাওয়া, ইত্যাদি লক্ষণ রয়েছে তাদের যক্ষা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এসব লক্ষণের সাথে যদি চিহ্নিত যক্ষারোগীর সাথে সংস্পর্শের ইতিহাস থেকে থাকে তাহলে সন্দেহ আরো জোরালো হয়। ফুসফুস ছাড়া অন্যান্য অঙ্গে যক্ষা হলে তার লক্ষণসমূহ, আক্রান্ত স্থানের ওপর নির্ভর করে, বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

ঘনবসতিপূর্ণ আমাদের দেশ নানা সমস্যায় জর্জরিত। হাজারো সমস্যার বিরুদ্ধে সীমিত সম্পদ নিয়ে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় আমাদের। যক্ষার বিরুদ্ধেও চলছে লড়াই। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাবিত DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) অর্থাৎ সরাসরি প্রত্যক্ষ চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলা-এলাকায়। অন্যান্য সংক্রামক রোগের মতো এ-রোগটি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে এর বিস্তার রোধ করা। সম্ভাব্য রোগী চিহ্নিত করে, রোগ সনাক্ত করে, সঠিক এবং প্রত্যক্ষ চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে তাদের রোগমুক্ত করা এবং একই সাথে এ-রোগের বিস্তার রোধ করাই উদ্দেশ্য। রোগটির চিকিৎসা সময়সাপেক্ষ। আট মাস কিংবা প্রয়োজনে আরো বেশি সময় ধরে নিয়মিত ওষুধ খেয়ে যেতে হয়। সাধারণত প্রথম দু'মাস নিবিড় (Intensive phase) পর্যায়ে চারটি ওষুধ নিয়মিত খেতে দেওয়া হয়। ওষুধ চারটি হচ্ছে: আইসোনিকোটিনিক এসিড হাইড্রাজাইড (আইএনএইচ), রিফামপিসিন,

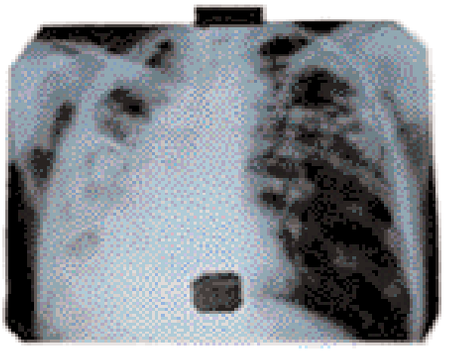

যক্ষায় প্রধানত আক্রান্ত হয় রোগীর ফুসফুস (ছবি: ইন্টারনেট)

পাইরাজিনামাইড ও ইথামবিউটল। পরবর্তী ছয় মাস অনুবর্তী (Continuation phase) পর্যায়ে আইএনএইচ এবং থায়াসিটাজোন বা ইথামবিউটল নিয়মিত খেতে দেয়া হয়। নিবিড় পর্যায়ের সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। DOTS কর্মসূচির আওতায় প্রথম দু'মাস সময় প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে রোগীর ওষুধ খাওয়া নিশ্চিত করা হয় এবং নিয়মিত ওষুধ সেবনের অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। এ-পর্যায়ে কোনো রোগী কিছুদিন ওষুধ গ্রহণ করে চিকিৎসা বন্ধ করে দিলে ওষুধপ্রতিরোধী জীবাণু গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধি, দীর্ঘসূত্রিতা এবং রোগীর জন্য নানা জটিলতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এর সাথে রোগীর মাধ্যমে জনপদে রোগটি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তো রয়েছেই। এ-রোগের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধগুলো অত্যন্ত দামী হলেও সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও-র মাধ্যমে সারাদেশেই বিনামূল্যে যক্ষারোগীদের জন্য এগুলো সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

রোগটি সনাক্তকরণ ও এর চিকিৎসা ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। রোগীর নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য এবং প্রতিবেশীদের জন্যও এটি ঝুঁকিপূর্ণ। একটি নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি যদি এ-রোগে আক্রান্ত হন তাহলে পরিবারটির কী দুর্দশা ভোগ করতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং আমাদের সচেতন হওয়া উচিৎ। শিশুকে জন্মের সময় টীকা দিয়ে দিতে হবে এবং অবহেলা না করে যার মধ্যে এ-রোগের লক্ষণ রয়েছে অবশ্যই তাকে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সবার সচেতনতার মধ্য দিয়ে রোগটি নিয়ন্ত্রণ করাই হবে আমাদের কর্তব্য, নয়তো ভবিষ্যৎ ভয়াবহতার হাত থেকে কারো রেহাই নেই।

শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ ও এর প্রতিকার

সায়েমা খোরশেদ

শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ মুলত যেসব জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয় তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া অন্যতম। বন্যা-পরবর্তী শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগের মধ্যে নিউমোনিয়া, কানের প্রদাহজনিত রোগ, ব্রঙ্কাইটিস, হুপিং কাশি, ব্রংকিওলাইটিস, ইত্যাদি বেশি হতে দেখা যায়। প্রতিবছর উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় সাড়ে চার মিলিয়ন শিশু শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে। এই সংখ্যা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় প্রায় সাতগুণ বেশি। শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগের প্রধান প্রধান ভাইরাস জীবাণুগুলো হচ্ছে: Respiratory syncitial virus, Adenovirus, Parainfluenza virus, Rhinovirus, Influenza virus, ব্যাক্টেরিয়াজাতীয় জীবাণুগুলো হচ্ছে: *Streptococcus pneumoniae*, *staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Escherichia coli* ও *Salmonella*। অন্যান্য যেসব জীবাণু শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগের জন্য কদাচিৎ দায়ী সেগুলো হলো: *Mycobacterium tuberculosis*, *Chlamydia*, *Trachomonas*, *pneumocystis carini*, *Mycoplasma pneumoniae*। শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগের জন্য কিছু কিছু পরিবেশগত কারণও মুখ্য হয়ে উঠতে পারে, যেমন অতিরিক্ত ঘনবসতি ও বড় পরিবার। অপুষ্টি, বিশেষত ভিটামিন এ'র ঘাটতি, কম জন্ম-ওজনসম্পন্ন শিশু, পরিবেশ দূষণ, মাতাপিতার ধুমপানজনিত কারণ (Parental smoking)। যেসব শিশুর কিছু বিশেষ রোগ আছে (Bown's syndrome, VSD) তাদের শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। মূলত হাঁচি-কাশির মাধ্যমে শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগের বিস্তার ঘটে এমন একটি ধারণা আগে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে জানা যায় যে, প্রদাহসম্পন্ন স্থানের স্পর্শে-আসা হাত থেকেও রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ মূলত লক্ষণ দ্বারা সনাক্ত করা যায়, যেমন কানের প্রদাহজনিত রোগে কান থেকে পূঁজ নিঃসরণ, হঠাৎ কানে ব্যথা-হওয়া, লাল হয়ে-যাওয়া টনসিলের প্রদাহের ক্ষেত্রে গলা-ব্যথা, ঢোক গিলতে কষ্ট-হওয়া এসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে। মূলত উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা কমপক্ষে ৫ দিন চিকিৎসা করলে এ-রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে। নিউমোনিয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ। মূলত এসব রোগীর কাশি ও শ্বাসকষ্টের পূর্ব ইতিহাস থাকে। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস এবং বুকের পাঁজর ওঠানামা দ্বারা নিউমোনিয়া সনাক্ত করা যায়। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বয়স অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়:

২ মাসের নিচে: মিনিটে ৬০ বারের অধিক শ্বাস প্রশ্বাস নিলে; ২ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত: মিনিটে ৫০ বারের অধিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে; ১ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত: মিনিটে ৪০ বারের অধিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-প্রদত্ত নীতিমালা দ্বারা নিউমোনিয়া রোগ খুব সহজে সনাক্ত করা যায়। নিচে বয়সভেদে তা বর্ণনা করা হলো:

এই নীতিমালা অনুযায়ী ২ মাসের নিচের শিশুদের জন্য রোগকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

ক. নিউমোনিয়া নয় এমন-কফ-কাশি

খ. মারাত্মক নিউমোনিয়া/অতি মারাত্মক নিউমোনিয়া

ক. নিউমোনিয়া নয় এমন কফ-কাশি হলে কোনো ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো এবং বাচ্চাকে গরম রাখাই এর চিকিৎসা। তবে শ্বাসকষ্ট হলে, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে, বুকের পাঁজর ভাঙলে বা বাচ্চা বুকের দুধ খেতে না পারলে সত্বর ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

খ. মারাত্মক নিউমোনিয়া/অতি মারাত্মক
নিউমোনিয়া হলে লক্ষণগুলো হলো: (১) বাচ্চা বুকের দুধ ভালোভাবে খেতে পারবে না, (২) শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে, (৩) দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিবে (মিনিটে ৬০ বারের অধিক), (৪) বুকের পাঁজর উঠানামা করবে, (৫) চেহারা নীলবর্ণ ধারণ করবে, (৬) খিঁচুনি দিতে পারে এবং (৭) বাচ্চার শ্বাস মাঝেমাঝে বন্ধ হয়ে যাবে।

চিকিৎসা: ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে, উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক (Benzyl penicillin ও Gentamicin) দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে অক্সিজেন দিতে হবে।

২ মাস থেকে ৫ বছর-বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে রোগকে চার পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

ক. নিউমোনিয়া নয় এমন সর্দি-কাশি
খ. নিউমোনিয়া
গ. মারাত্মক নিউমোনিয়া
ঘ. অতি মারাত্মক নিউমোনিয়া

ক. নিউমোনিয়া নয় এমন সর্দি-কাশি
শুধুমাত্র সাধারণ কাশির জন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

খ. নিউমোনিয়া
লক্ষণ : রোগী দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিবে (২ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত মিনিটে ৫০ বারের অধিক, ১ বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত মিনিটে ৪০ বারের অধিক), কিন্তু বুকের পাঁজর ভাঙবে না।
চিকিৎসা: Amoxycillin, Cotrimoxazole দ্বারা চিকিৎসকের পরামর্শে বাসায় এর চিকিৎসা করা সম্ভব, কিন্তু রোগীর অবস্থার অবনতি হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে হবে।

গ. মারাত্মক নিউমোনিয়া
লক্ষণ: বুকের পাঁজর ভেঙে আসবে।
চিকিৎসা: উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক (Benzyl penicillin) দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে।

ঘ. অতি মারাত্মক নিউমোনিয়া
লক্ষণ: রোগী পানি পান করতে পারবে না, রোগীর শরীর নীলবর্ণ ধারণ করবে।
চিকিৎসা:ক্লোরামফেনিকল (Chlorampheni-col) অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে অক্সিজেন ব্যবহার করতে হবে।

ব্রংকিওলাইটিস: ছয় মাস থেকে আঠারো-মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে Bronchiolitis নামের রোগ দেখা যায়। Respiratory syncitial virus এ-রোগের মূল কারণ। এ-রোগের লক্ষণ হলো: (১) হঠাৎ কাশি ও শ্বাসকষ্ট, (২) বুকের খাঁচা ভেঙে-যাওয়া, (৩) জ্বর থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, (৪) খাওয়া কষ্টকর হয়ে যেতে পারে। এই লক্ষণ সত্ত্বেও শিশু প্রায়ই হাসিখুশি এবং ভালো থাকে।
চিকিৎসা: যদিও অ্যান্টিবায়োটিকের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই (কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাস এ-রোগের কারণ) তবুও শিশুর যদি জ্বর থাকে বা শ্বাসকষ্ট অত্যধিক হয়, তবে অ্যান্টিবায়োটিক অনেক সময় ব্যবহার করা হয়।

ব্রংকিয়াল অ্যাজমা (Bronchial asthma): এ-রোগে বিশেষ কিছু পরিবেশজনিত অবস্থার প্রতি শ্বাসনালীর সংবেদনশীলতার কারণে বায়ুপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়। এ-রোগে সাধারণত কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলায় শা-শা শব্দ, ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। সাধারণত যেসব বিষয়ের প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে এ-রোগ হতে পারে সেগুলো হলো: (১) বিভিন্ন প্রকার ধূলাবালি, (২) কলকারখানা ও সিগারেটের ধোঁয়া, (৩) খাদ্যদ্রব্য, যেমন গরুর মাংস, ইলিশ মাছ, ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে বংশগত অ্যাজমার ইতিহাসও দেখা যায়। যেসব শিশুর ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট হয়, প্রায়ই শুকনা কাশি দেখা যায়, অ্যালার্জি থাকে, বংশের কারো অ্যাজমা রোগের ইতিহাস থাকে, তাদের এ-রোগের সম্ভাবনা সর্বাধিক।
চিকিৎসা: লক্ষণ বুঝে Bronchodilator (Salbutamol theophyllin), প্রদাহ নিবা-রণকারী ওষুধ (Sodium chronoglycate, steroid), ইত্যাদি দ্বারা অ্যাজমার চিকিৎসা করা হয়।

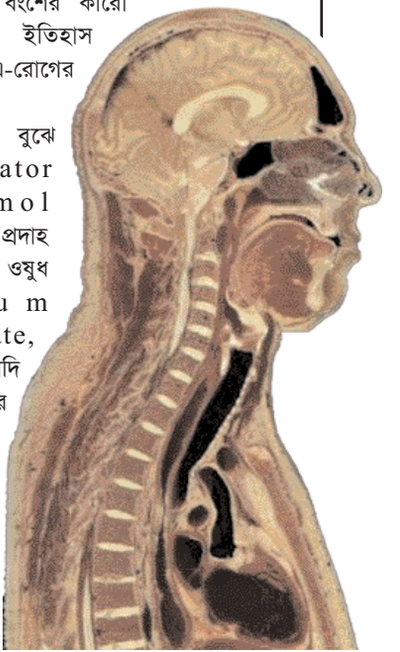

ডেঙ্গু জ্বর: প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

নন্দিতা নাজমা

পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যায় জর্জরিত। আর্সেনিক বিষক্রিয়া, লেড বিষক্রিয়া ও ঘাতক ব্যাধি এইডস নিয়ে যখন জনগণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ঠিক তখন আবার নতুন করে ফিরে-আসা ডেঙ্গু জ্বর জনগণকে রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। প্রতিদিন সংবাদপত্রে আসছে ডেঙ্গু জ্বরের খবর।

ইতিহাস: ডেঙ্গুর মহামারী প্রথম ঘটে ১৭৭৯ সালে জাকার্তা ও কায়রোতে। তবে সেই জ্বর ছিলো ডেঙ্গু-সদৃশ রোগ যার কারণ ছিলো শিকুনগুনিয়া ভাইরাস। এরপর ১৭৮০ সালে ডেঙ্গু জ্বর মহামারী আকারে দেখা দেয় ফিলাডেলফিয়াতে। ডেঙ্গু কিংবা ডেঙ্গু-সদৃশ আরো মহামারীর রিপোর্ট পাওয়া যায় উনিশ-শতকে ও বিশ-শতকের প্রথমদিকে। এটা ঘটে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, কলকাতা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, হংকং, আমেরিকা, গ্রীস ও অস্ট্রেলিয়াতে। তবে সেসময় ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহতা তেমন ছিলো না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ডেঙ্গু জ্বরের মহামারীর ধরন বদলে যায়। ডেঙ্গু জ্বর আরো জটিল আকারে মহামারীর রূপ নেয়। ডেঙ্গু হোমোরেজিক ফিভার এবং ডেঙ্গু-শক সিনড্রোম-এর মত জটিল ধরনের ডেঙ্গু জ্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই বেশি ঘটেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১৯৮১ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এ-রোগে আক্রান্ত হয়েছে ৭ লাখেরও বেশি এবং ডেঙ্গু জ্বরে মারা গেছে প্রায় ৯ হাজারের বেশি লোক। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার প্রথম দেখা দেয় ফিলিপাইনে ১৯৫৪ সালে। এরপর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরের প্রকোপ বাড়তে থাকে এবং ১৯৮৭ সালে ভিয়েতনামে সবচেয়ে বড় আকারে ডেঙ্গু মহামারী ঘটে। আমাদের দেশে ১৯৬৪ সালে একবার ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সেসময় এই জ্বর 'ঢাকা ফিভার' নামে পরিচিত হয়। গত কয়েক বছরও ডেঙ্গুর ছোটখাট আক্রমণ হয়েছিলো। গত দুই শতাব্দী ধরে ডেঙ্গু জ্বর বিভিন্ন নামে পরিচিত হচ্ছে, যেমন ব্রেকবোনফিভার, ড্যান্ডিফিভার, জিরাফ জ্বর, পলকা জ্বর, ৫-৭ দিনের জ্বর, ঢাকা ফিভার, ইত্যাদি।

রোগের কারণ: ডেঙ্গু জ্বর ভাইরাসজনিত ব্যাধি। ডেঙ্গু ভাইরাস হল ফ্লাভো ভাইরাস পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৪ সালে ডক্টর আলবার্ট সাবিন ডেঙ্গুর ভাইরাস সনাক্ত করেন এবং ডেঙ্গু-১, ডেঙ্গু-২ নামে দু'টো ভাইরাসকে আলাদা করেন। পরবর্তী কালে আরো দু'টি নতুন ডেঙ্গু ভাইরাস সনাক্ত করা হয় এবং এদের নামকরণ করা হয় ডেঙ্গু-৩ ও ডেঙ্গু-৪। এই ৪ ধরনের ভাইরাসই ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার, বা ডেঙ্গু-শক সিনড্রোম ঘটাতে পারে।

বাহক: এডিস এজেপটি ও এডিস এলবো-পিকটাস নামের মশা ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক। প্রথমটি সাধারণত শহর-এলাকায় বেশি থাকে এবং এডিস এলবোপিকটাস গ্রামাঞ্চলে বেশি পাওয়া যায়, তবে শহরেও থাকতে পারে। এই মশা দেখতে নীলচে কালো বর্ণের। গায়ের উপর সাদা-সাদা ছোট-ছোট ছোপ। মশাটি মাটির সাথে সমান্তরালভাবে বসে। এই মশার আদিস্থান আফ্রিকার জঙ্গল বলে ধারণা করা হয়। সেখানে বর্ষাকালে গাছের কোটরে জমে-থাকা পানির ভিতর এরা ডিম পাড়তো। বৃষ্টির পর পূর্ণাঙ্গ মশার উৎপাত কমতে থাকে। ক্রমেই শহর গড়ে-ওঠা এবং শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে এজিপটি মশার অভিযোজন ঘটে। শহুরে জীবনযাত্রার সাথে এরা খাপ খাইয়ে নেয়। তবে এখনও এডিস মশার বন্য ধরনটি আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে বৃষ্টির পানি জমে-থাকে--চৌবাচ্চা, ফুলের নার্সারী--এসমস্ত জায়গা মশার ডিম পাড়ার আদর্শ স্থান। ডিম ফুটে মশায় পরিণত হতে সময় নেয় ৬ থেকে ৮ দিন। এই মশা সমুদ্র সমতলের ৪৫০০ ফুট উপরেও থাকতে পারে। এই মশা সাধারণত দিনের বেলাতে কামড়ায়, বিশেষ করে খুব ভোরে এবং শেষ বিকেলে। ডেঙ্গু ভাইরাসে সংক্রামিত স্ত্রী-প্রজাতির এডিস এজিপটি মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর হয়।

রোগের লক্ষণসমূহ: মশা কামড়ানোর ৪ থেকে ৭ দিনের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। শিশু, পূর্ণবয়স্ক মানুষ এবং পর্যটকদের এই রোগ বেশি হয়ে থাকে। ছোট শিশুদের বেলায় এই রোগ ততটা মারাত্মক আকারে দেখা দেয় না। তবে, একটু বড় বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

ডেঙ্গু ক্ল্যাসিকাল জ্বর-এর লক্ষণ

- হঠাৎ করে জ্বর শুরু হয় (১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট) • মাথা-ব্যথা • হাড়ে-ব্যথা
- চোখের পিছনে ব্যথা • মাংসপেশীতে ব্যথা
- গিরায় ব্যথা • ক্ষুধামন্দা • সমস্ত শরীরে লাল রঙের চাকা, বিশেষ করে বুকে ও উর্দ্ধাঙ্গসমূহে।

এছাড়া রক্তে শ্বেতকণিকার পরিমাণ কম পাওয়া যাবে। জ্বর সারার পর রক্তে এন্টিবডি টাইটার বেশি পাওয়া যাবে। এই জ্বরকে ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর বলা হয়, কারণ এটি সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর।

ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার-এর লক্ষণ

- হঠাৎ করে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। এই জ্বর দুই পর্যায়ে হয়ে থাকে। এই জ্বর থাকে ২ থেকে ৭ দিন। জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, কাশি ও বমি হতে পারে।
- এরপর হঠাৎ তাপমাত্রা কমে যায়। এই সময়ের ২৪ ঘণ্টা আগ থেকে ২৪ ঘণ্টা পরবর্তী পর্যন্ত সময়কে বলা হয় সংকটপূর্ণ সময়। এই সময়টা খুবই জটিল।
- এরপরই রক্তক্ষরণজনিত উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়, যেমন: নাক দিয়ে রক্ত-পড়া, মাড়ি দিয়ে রক্ত-পড়া, পায়খানার সাথে রক্ত-পড়া, রক্ত-বমি, শরীরে রক্তের চাকাও দেখা দিতে পারে।

এসময় রক্তের অণুচক্রিকার পরিমাণ কমে যায় এবং রক্তনালী থেকে রক্তরস বেরিয়ে টিস্যুতে জমা হতে থাকে। ফলে ফুসফুসের ঝিল্লিতে পানি জমতে পারে, পেটে পানি জমতে পারে এবং রক্তে এলবুমিন কমতে পারে। এসময় রক্তের ঘনত্ব মাপলে তা বেশি পাওয়া যেতে পারে। রোগীকে এই সংকটাপন্ন সময়ে হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ারে রেখে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। ২৪-৩৬ ঘণ্টা সময় সঠিকভাবে

পেশীতে এধরনের চাকা-চাকা রক্তের চিহ্ন দেখা গেলে বুঝতে হবে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার হয়েছে

রোগীকে পরিচর্যা করলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। প্রথমবার ডেঙ্গু জ্বরে হেমোরেজিক ফিভার হয় না। পরবর্তী সময়ে অন্য সেরোটাইপ ভাইরাসের আক্রমণে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার হতে পারে।

ডেঙ্গু-শক সিনড্রোম

ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের সমস্ত লক্ষণসমূহের উপস্থিতি ছাড়াও অন্যান্য যেসব লক্ষণ এই সিনড্রোমে দেখা যায় সেগুলো হলো:

- দ্রুত ও দুর্বল নাড়ী • রক্তচাপ দ্রুত কমতে থাকে • হাত-পা ঠাণ্ডা ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়
- অস্থিরতা বেড়ে যায়।

যেসমস্ত রোগী ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে ভোগে তার ২০-৩০ ভাগই ডেঙ্গু-শক সিনড্রোমে চলে যায়। এক্ষেত্রে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪০ থেকে ৫০ ভাগ। তবে ইনটেনসিভ কেয়ারে রোগীকে রাখলে মৃত্যুর হার ২%-এ নেমে আসে।

ডেঙ্গু-সদৃশ জ্বর

ডেঙ্গু জ্বরের মত উপসর্গবিশিষ্ট শিকুনগুনিয়া জ্বরও মহামারী আকারে দেখা যায়। ডেঙ্গুর মত শিকুনগুনিয়া ভাইরাসও এডিস মশা দ্বারা বাহিত। পৃথিবী জুড়েই এদের অবস্থান। দক্ষিণ এশিয়াতে ডেঙ্গু ও শিকুনগুনিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব একই সাথে ঘটে থাকে। আমাদের দেশে বর্তমানে যে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটছে তার সবগুলোই ডেঙ্গু নয়, সাথে শিকুনগুনিয়া জ্বর থাকারও সম্ভাবনা আছে বলে আমাদের দেশে কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করেছেন। শিকুনগুনিয়া জ্বর ছাড়াও আরো ২ ধরনের ডেঙ্গু-সদৃশ জ্বর আছে, যেমন: ওনিয়ং নিয়ং এবং জয়েন্ট নাইল জ্বর। তবে এগুলোর ভৌগলিক অবস্থান ভিন্ন।

রোগ নির্ণয়

এই রোগের শুরুতেই তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। জ্বর শুরু হবার পর থেকেই রোগীকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন এবং মহামারীর সময় ফিভার সার্ভিলেন্স করা প্রয়োজন। এতে করে দ্রুত রোগ নির্ণয় করা যায় এবং মৃত্যুর ঝুঁকিও কমে আসে। ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার এবং ডেঙ্গু-শক সিনড্রোম নির্ণয়ের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এগুলো দ্রুত রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে অথবা রোগ নির্ণয় ত্রুটিপূর্ণ হবার ঝুঁকিও কমে যায়।

ক্লিনিকাল বৈশিষ্ট্য

- উচ্চমাত্রায় জ্বর (১০৩ থেকে ১০৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট)

- ক্ষরণ (অল্প অথবা বেশি)

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিম্নোক্ত ফলাফল দেখা যায়:

- অণুচক্রিকার সংখ্যা ১ লাখ কিউবিক মি.মি. অথবা তার কম
- কণিকার ঘনত্ব বেশি পাওয়া যায় (২০ ভাগ অথবা তার বেশি)
- রক্তে এলবুমিনের পরিমাণ কমে যায়
- ডেঙ্গু-শক ডিনড্রোমের ক্ষেত্রে উপরের বৈশিষ্ট্যের সাথে হাইপোটেনশন যুক্ত হয় অর্থাৎ রক্তচাপ--পারদযন্ত্রে ২০ বা আরো কম হয়।

প্রথম দু'টি ক্লিনিকাল বৈশিষ্ট্য এবং ১টা ল্যাবরেটরি পরীক্ষা যদি পজিটিভ হয় (অন্তত পক্ষে হিমাটোক্রিটের মাত্রা যদি বেড়ে যায়) তাহলেই ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর বলা হয়।

ডেঙ্গু জ্বরের রোগীর যেসব ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করা প্রয়োজন সেগুলো হলো:

- রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাপ (Platelet count)
- রক্তকণিকার ঘনত্বের (Haematocrit) পরিমাপ
- রক্তে ডেঙ্গু ভাইরাসের এন্টিবডি টাইটার-এর পরিমাপ। (রক্তে দু'ধরনের এন্টিবডি তৈরি হয়। প্রথমবার আক্রমণের ৫-৭ দিনের মধ্যে আইজিএম এন্টিবডি পাওয়া যায়। ১৪ দিনের মধ্যে আইজিজি এন্টিবডি পাওয়া যায়। একাধিকবার ডেঙ্গু-আক্রান্ত ব্যক্তির বেলায় আইজিজি এন্টিবডি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় রক্তরসে অবস্থান করে)।
- ভাইরাস আইসোলেশন (আমাদের দেশে এখনও এর প্রচলন হয় নি)।

আমাদের দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ল্যাবরেটরি ও আইসিডিডিআর,বিতে রক্ত পরীক্ষায় প্রায় ৬০% মানুষের দেহে এন্টিবডির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব থেকে বোঝা যায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক ডেঙ্গু জ্বরে জনগণের একটি বিরাট অংশ আক্রান্ত হয়ে গেছে।

ব্যবস্থাপনা

ডেঙ্গু জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল দিতে হবে। কখনোই এসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম বা আইবুপ্রুফেনজাতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে না। এগুলোতে রক্তক্ষরণের মাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়া 'র‍্যা সিনড্রোম' নামে এক মারাত্মক অবস্থা দেখা দিতে পারে। রোগীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ও তরল খাবার খেতে দেওয়া প্রয়োজন এবং রোগীকে সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরই সাধারণত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর রক্তক্ষরণ শুরু হয়; এসময় ৪৮ ঘণ্টা রোগীকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন। জ্বর সেরে যাওয়ার পর ৭ দিন সুস্থভাবে পার হলে বোঝা যাবে এবারকার মতো রোগী সুস্থ হয়ে গেছে। আবার যাতে মশা না-কামড়াতে পারে সেদিকে খুব লক্ষ রাখতে হবে। জ্বর সেরে যাওয়ার পর রোগীর যদি নাক, মাড়ি বা শরীরের যেকোনো স্থান থেকে রক্তপাত শুরু হয় অথবা প্রচণ্ড পেটব্যথা শুরু হয় কিংবা ত্বকের নিচে লালচে ছোপ দেখা যায়, তবে সাথে সাথে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। ডেঙ্গু-শক সিনড্রোমে শিরায় স্যালাইন, রক্ত-সঞ্চালন বা অণুচক্রিকা সঞ্চালন-এর প্রয়োজন হতে পারে।

রোগী কখন হাসপাতালে ত্যাগ করবে এ-ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক একটি নীতিমালা নির্ধারণ করা আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে যে-অবস্থায় রোগী হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারে তা হলো:

- জ্বর কমানোর ওষুধ ছাড়াই যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আর জ্বর না আসে
- খাওয়ার রুচি ফিরে আসলে
- রোগীর উপসর্গ লক্ষ ক'রে সুস্থ মনে হলে
- প্রস্রাবের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসলে
- হিমাটোক্রিটের মাত্রা স্থিতিশীল হয়ে এলে
- রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা ৫ হাজারের বেশি থাকলে
- ফুসফুসে পানি-জমার অথবা পেটে পানি-জমার কারণে শ্বাসকষ্ট না থাকলে
- রোগী শক থেকে সেরে ওঠার ২ দিন অতিবাহিত হলে।

প্রতিরোধ

ডেঙ্গু জ্বরের কোনো প্রতিষেধক ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত না হওয়ায় প্রতিরোধই এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায়। ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপ আছে। এই চারটার যেকোনো একটা থেকেই ডেঙ্গু জ্বর হয়। একবার কেউ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে এবং সুস্থ হয়ে উঠলে যে-ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলো ঐ ভাইরাসের বিরুদ্ধে রোগীর আজীবন প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তবে বাকি ৩ ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় না। ফলে রোগীর আরও তিনবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ একজন মানুষ ৪ বার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতে পারে। সেকারণেই একবার ডেঙ্গু জ্বর থেকে সেরে উঠার পরও মশার কামড় থেকে রক্ষা পেতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাহক মশার দমনই ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধের প্রথম উপায়। এডিস মশা নির্মূলের জন্য প্রয়োজন মাটির হাঁড়ি, বাড়িতে ফুলের টব, অব্যবহৃত কৌটা, ড্রাম, নারিকেলের মালায় পানি জমতে না-দেওয়া বা স্যাঁতস্যাঁতে হতে না-দেওয়া কারণ এগুলোতে জমে-থাকা পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। তাই প্রতিদিনই এসব পরিষ্কার করতে হবে। বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। ফ্রিজের নিচে জমে-থাকা পানি, এয়ারকুলারের পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

মশা নিধনের জন্য বাড়িতে মশার কয়েল, ম্যাট ও স্প্রে ব্যবহার করতে হবে, মশারী ব্যবহার করতে হবে, এমনকি দিনের বেলাতেও ব্যবহার করতে হবে। ঘরের দরজা ও জানালায় নেটিং-এর ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়।

সরকারি পর্যায়ে যা যা করণীয়

- সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেকশন-এর বিশেষজ্ঞ নিয়ে অবিলম্বে কমিটি গঠন করা আবশ্যক। প্রতিটি সেকশনের টিমকে দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া জরুরী
- মেডিকেল টিম গঠন
- শহরে মশা নিধনের অভিযান চালানো
- শহর-এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভিযান
- ডেঙ্গু-জ্বর নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন, যেমন: টেলিভিশন, বেতার, খবরের কাগজ, লিফলেট, ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়ানো উচিত।

পৃথিবীর যেসব দেশে ডেঙ্গু জ্বর মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে যেসব দেশে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিউবাতে প্রথম তেল ও সালফার ধোঁয়া দিয়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ডিডিটি ব্যবহার করা হতো। এখনও কোনো কোনো দেশে ডিডিটি'র ব্যবহার আছে। থাইল্যান্ড ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এডিস মশা নির্মূলের জন্য লারভিসাইড এবং ম্যালাথিয়ন ফগিং ব্যবহৃত হচ্ছে। একই সাথে ঘরবাড়ির বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার নিয়ম চালু আছে। মালয়েশিয়ায় 'মসব্যাক' নামে এক ধরনের কেমিক্যাল মশা নিধনে ব্যবহার করে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বড় শহরগুলোতেও ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক জেলা-শহর, উপজেলা, পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যেমন: মশা নিধন অভিযান, মেডিকেল টিম গঠন করে জ্বর সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম গ্রহণ করা এবং শহর-এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া। এছাড়া ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলার দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গ্রহণ করা উচিত।

ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য যা যা করণীয়

- বস্তিগুলোতে ব্যাপক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও গণসচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে
- রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রতিরোধের উপায় ও জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে
- ডেঙ্গু-আক্রান্ত রোগীকে মশারীর মধ্যে রাখতে হবে
- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অফিসগুলোতে সপ্তাহে বা মাসে ১ দিনের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে হবে
- শুক্রবার জুম্মার নামাজ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ইমাম সাহেব ও ডাক্তারের বা স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে প্রতিরোধ বার্তা ছড়াতে হবে
- ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহতা না-কমা পর্যন্ত খবরের কাগজে খুব প্রয়োজনীয় পরামর্শগুলো ছাপাতে হবে
- প্রতিবছর সিটি কর্পোরেশনগুলোকে মশক নিধনের জন্য নিয়মিত পর্যাপ্ত বাজেট রাখতে হবে ও কার্যক্রম হাতে নিতে হবে
- কন্ট্রোল রুম খুলে কেন্দ্রীয়ভাবে তা সমন্বয় করতে হবে এবং জনগণকে সংগঠিত করতে হবে।

ডেঙ্গুর ভাইরাসবাহী এডিস মশাটিকে চিনে রাখুন

For updating your knowledge on health, population and nutrition research

subscribe to high-quality peer-reviewed quarterly

Journal of Health, Population and Nutrition
(ISSN 1606-0997)

The Journal disseminates findings of well-designed studies conducted by professionals working in developing countries, highlights the interactions among infectious diseases, population, and nutrition, and informs others of new research and advances. The Journal generally covers the following key topics:

Health systems; maternal, child and family health; perinatal, infant and child mortality; impacts of infections on health and foetal outcomes; sexually transmitted diseases; reproductive health; immunization and vaccines in developing countries; public health and health equity; emerging and re-emerging diseases; nutrition and child development; and demographic transition

Annual Subscription Rates (including mailing cost) for 2005
Tk 1,000.00 for institutions and Tk 750.00 for individuals

Cheque, Bank Draft, or Pay Order, drawn on any bank in Bangladesh, should be issued in favour of:

"International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh"

All correspondence regarding subscriptions should be addressed to:

Managing Editor, Journal of Health, Population and Nutrition
ICDDR,B: Centre for Health and Population Research
GPO Box 128, Dhaka 1000, (Mohakhali, Dhaka 1212), Bangladesh
Email: jhpn@icddrb.org; phone: +(880-2)-882 2467
Fax: +(880-2)-989 9225 or +(880-2)-882 3116

Foreign subscribers must pay in US dollar, Pound Sterling, or Euro at a different rate not shown here

বাংলাদেশ এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠী

এ. এইচ. নওশের উদ্দীন

(গত সংখ্যার পর)

বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবে যৌথ পরিবার বিরাজমান। এসব পরিবার স্বামী-স্ত্রী ও অবিবাহিত এমনকি বিবাহিত সন্তান, বেকার সন্তান, পিতা-মাতা, তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা বোন, অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গঠিত। এসব পরিবার সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে, পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চিত করে, নিরাপত্তা বিধান করে, এবং বৃদ্ধ ও শিশুদের যত্ন নেয়। সাম্প্রতিক কালে জনমিতিক, আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পরিবারের গঠন, ভূমিকা ও এর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। যৌথ পরিবারসমূহ এখন বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এবং এর স্থানে আসছে একক পরিবার, যা স্বামী-স্ত্রী ও অবিবাহিত সন্তান নিয়েই মূলত গঠিত। ১৯৯৪ সালে এই একক পরিবারের হার ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ১৯৮৪ সালে ছিলো ৪০ শতাংশ। সুতরাং প্রবীণরা ক্রমবর্ধমান হারে পরিবারের ওপর নির্ভরশীলতা হারাচ্ছে।

কর্মক্ষম লোকের আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাস: বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ বিধায় উন্নত বিশ্বের মত এখানে প্রবীণদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। প্রবীণ লোকদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় পরিবারের কর্মক্ষম লোকজনের ওপর নির্ভর করে এবং তাদের রোজগারের ওপর ভিত্তি করে, প্রধানত যারা তাদের সন্তান বা নাতি-নাতনি। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ক্রমবৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, প্রতি ১ জন প্রবীণ লোকের বিপরীতে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা থাকবে মাত্র ৬.২ জন, যা বর্তমানে ১৮.৬ জন।

দারিদ্র্য: দারিদ্র্য প্রবীণদের জন্য অভিশাপস্বরূপ। দরিদ্র হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় অবসর ভাতা না থাকার কারণে ৭০ শতাংশ প্রবীণ লোক বাংলাদেশী শ্রমের বাজারে সক্রিয়, অথচ উন্নত বিশ্বে মাত্র ৬ শতাংশ প্রবীণ লোক শ্রমজীবী।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলা: বর্তমানে মহিলারা ক্রমবর্ধমান হারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হচ্ছে। ফলে, গৃহস্থালি কাজ ও শ্রমে অংশগ্রহণের হার ১৯৮৪-১৯৮৬ সালে ৯.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৫৮.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ-কারণে প্রবীণদের জন্য নিবেদিত তাদের সময় হয়ে পড়ছে সংকুচিত।

প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা: বয়োবৃদ্ধি মানেই শরীরের কর্মক্ষমতা ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া এবং বিভিন্ন রোগ ও জরাজীর্ণতায় আক্রান্ত হওয়া। রোগ-জরা থেকে বাঁচতে গেলে প্রয়োজন অর্থ ও চিকিৎসা। এই চিকিৎসার চাহিদা আমৃত্যু থেকে যায়। বিশ্বব্যাপী অ-সংক্রামক ব্যাধি, যেমন হৃদরোগ, ক্যান্সার বা মানসিক রোগ নিয়ে ভাবার অবকাশ সীমিত। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫-এ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের কথা আছে; এছাড়া স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর প্রোগ্রামে (যা ১৯৯৮-২০০৩ সালে বাস্তবায়িত হয়) মহিলা, শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়নের কথা বিবৃত হয়েছে। তবু স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর প্রোগ্রামের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ মূলত শিশু ও ১৫-৪৯ বছর বয়স্ক মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। একীভূত তথ্য ব্যবস্থাপনা (ইউএমআইএস) পদ্ধতিতে শুধু মহিলা ও শিশুদের জন্য প্রদেয় সেবা-তথ্যই প্রতিফলিত হয়, প্রবীণদের নয়। প্রবীণদের রোগ-ব্যাধি ও সেবা-সংক্রান্ত জনপদ-ভিত্তিক কোনো তথ্য বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। সরকারি হাসপাতাল-ভিত্তিক তথ্যে দেখা যায়, ৫৫ বছর এবং এর চেয়ে বেশি বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যে মৃত্যুর প্রধানতম কারণ হচ্ছে: জ্বর (৮%), হৃদরোগ (৯%), মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (১২%), উচ্চ রক্তচাপ (৮%), হাঁপানি (৫%) ও গ্যাস্ট্রিক (৩%)।

যশোর জেলার অভয়নগরে আইসিডিডিআর,বি-পরিচালিত জনমিতিক নিরীক্ষণ ব্যবস্থায় দেখা যায়, ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত মোট ৩,৪৬৮টি মৃত্যুর মধ্যে ১,৩১২টি মৃত্যু ৬০ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়সের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এদের মৃত্যুর প্রধানতম কারণ হচ্ছে: হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতা (২০.৪%), বার্ধক্যজনিত জটিলতা (৩১.৭%), শ্বাসতন্ত্র-সংক্রান্ত জটিলতা (১০.২%), ক্যান্সার (৩.৯%), লিভার-সংক্রান্ত জটিলতা (২.৩%) ও স্নায়বিক জটিলতা ৩.৬%)।

প্রবীণদের কল্যাণে কী কী করা হয়েছে

সরকারি পর্যায়ে: বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি প্রবীণদের জীবন-যাপন ও তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসবের মধ্যে কয়েকটি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা হলো:

১. প্রবীণদের জন্য মাসিক ১৫৬ টাকা হারে বয়স্ক ভাতা চালু হয়েছে, প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে ১০ জন প্রবীণ এই ভাতা পান। এদের মধ্যে অর্ধেকই হবেন দুঃস্থ মহিলা, যারা স্বামী-পরিত্যক্তা ও বিধবা।

২. প্রবীণদের জন্য জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার সভাপতি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

৩. ১লা অক্টোবরকে 'প্রবীণ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বেসরকারি পর্যায়ে: বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে 'প্রবীণ হিতৈষী সংঘ' নামে একটি সংগঠন ইউএনএফপিএ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাহায্যে সীমিত আকারে প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে। বেসরকারি সংগঠন, যথা ব্র্যাক, বিডব্লিউএইচসি সীমিত পরিসরে গবেষণাস্থল এবং নির্বাচিত স্থানে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে। আইসিডিডিআর,বিও প্রবীণদের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে: ব্যক্তিগত পর্যায়েও কিছু 'বৃদ্ধ নিবাস' গড়ে উঠেছে, যারা প্রবীণদের জন্য অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে গাজীপুর জেলায় অবস্থিত খতিব আব্দুল জাহিদ মুকুল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বয়স্ক ও শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।

যা করা দরকার

১. বাংলাদেশে প্রবীণদের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত যেসব তথ্য তাদের জীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দরকার তা প্রকৃতপক্ষে অজানা। তাঁরা কোথায় থাকেন, কার সাথে থাকেন, কিভাবে থাকে, কী খান, কিভাবে তাদের ভরণ-পোষণ করা হয়, এসব বিষয়ে জানা দরকার এবং ব্যাপক গবেষণা দরকার।

২. তারা কী কী কাজে সক্ষম, তাঁদের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি কী এবং এই সমস্যা নিরসনের কী ব্যবস্থা নেন, এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানা দরকার।

৩. শিশু ও মহিলাদের পাশাপাশি বয়স্কদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

৪. যৌথ পরিবার কাঠামোর ভাঙ্গনরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত।

৫. স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করে প্রবীণদের আবাসন, ভরণ–পোষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

৬. প্রবীণদের জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতাকে চিহ্নিত করে কাজে লাগানো উচিত।

উপসংহার

একা-একা জীবন ধারণে প্রবীণদের অপারগতা ও সীমাবদ্ধতা তাদের সৃষ্ট নয়, প্রকৃতিরই অমোঘ বিধান। এ-অবস্থা থেকে কারো পরিত্রাণের উপায় নেই। তাই এদের প্রতি আর কোনো অবহেলা নয়। তাঁদের জন্য দিতে হবে সময় ও সঙ্গ এবং অনুধাবন করতে হবে তাঁদের অনুচ্চারিত ব্যথা-বেদনা, করতে হবে তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা। তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ মর্যাদাও দিতে হবে। শৈশবে যে আদর-মমতায় তাঁরা সন্তানদের লালন-পালন করেছেন, সেই একই মমতার পরশে তাঁদেরকে সিঞ্চিত করে রাখার দায়িত্ব এখন তো সেই সন্তানদেরই।